মেঘলা মেয়ে

মোরশেদা কাইয়ুমী

ওয়াফি পাবলিকেশন

০১. আকাশের অশ্রু

রাত প্রায় বারোটা থেকে ঝুম তালে বৃষ্টি হচ্ছে। থামাথামির কোনো লক্ষণ দেখছে না আদ্রি। অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতা চারিদিকে। রাস্তায় মানুষ দূরে থাক একটা কুকুরও দেখা যাচ্ছে না। ওরা হয়তো কোনো নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে যে যার মতো। সাধারণত মিরপুরের এই দিকটা এমনিতেও নিরিবিলি থাকে। এখানের বাসিন্দারা প্রায় সবাই হয়তো নীরবতাপ্রেমী, সে মানুষ হোক কিংবা রাস্তার কুকুর-বিড়াল।

আদ্রি আকাশের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। রাস্তার সোডিয়াম লাইটের আলো বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে কেমন যেন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল আদ্রির চোখে।

আচ্ছা আকাশেরও কি অনেক কষ্ট ওর মতো? ব্যালকনির গ্রিলের ফাঁক দিয়ে দু-হাত বের করে বৃষ্টির পানি দিয়ে মুঠো ভরতি করতে করতে ভাবে সে। অবাক বিস্ময়ে সে দেখে, বৃষ্টির পানি হাতের ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে পড়লেও আবার মুঠোতে নতুন পানি এসে ভরতি হয়ে যাচ্ছে।

মেঘের সাথে তাল মিলিয়ে চোখের নোনাজল ঝরাতে থাকে আদ্রি। মুঠোতে নতুন করে পানি এসে ভরে গেলেও তার জীবনে আসা নতুন মানুষটা তো তাকে ভরিয়ে দেয়নি। কষ্টই যদি দেবে এমন, জোর করে তবে কেন এসেছিল তার জীবনে?

হাত মুছে মোবাইলটা হাতে নেয় আবারও। ইনবক্সে আসা একটার পর একটা **স্ক্রিনশট** পড়তে পড়তে দু-চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। সে যে মেয়েটাকে সামান্য তেজ দেখিয়ে বলেছিল, 'মানুষটা তার', মেয়েটার পাঠানো **স্ক্রিনশট** তার সেই তেজে যেন থুথু ছিঁটে মারছে।

‘কী ম্যাম? চুপ কেন এখন? রিপ্লাই দিচ্ছেন না যে? খুব তো নিজের জামাই দাবি করতে এসেছিলেন তখন। দেখুন তো জামাইটা আসলেই আপনার কি না। নাহ, সে আপনার কখনোই ছিল না। আমাদের নিয়েই সে সুখে ছিল সব সময়।’

মেয়েটার মেসেজ পড়ে লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে আদ্রির নিজেকে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করে। এই নিয়ে কত নাম্বার হলো? নাহ! জানে না সে। জানতে ইচ্ছেও করে না।

বিয়ের পর একটা মাসও থাকেনি মানুষটা তার সাথে। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে একটার পর একটা মেয়ের সাথে পরকিয়া করেই গেছে সে। অফিসের কাজে যাচ্ছে বলে বাসা থেকে বের হতো। কিন্তু বাস্তবে সে এই মেয়ের সাথে গিয়ে এসব নোংরামি করে বেড়াত।

মেয়েটার ওপর আগে থেকেই সন্দেহ ছিল আদ্রির। ফেইসবুকে সুমনের পোস্টে, ছবিতে নানা সময় নানা ধরনের কমেন্ট করতে দেখেই মূলত সন্দেহটা জাগে। যদিও আদ্রির আসল আইডিটা সুমনের ব্লকলিস্টে। তাই হয়তো নিশ্চিন্তে ওদের কথাবার্তা চলত কমেন্টেও। সেই থেকে অনেক ভেবে ঐ আইডিটা দিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে তুলে মেয়েটির সাথে।

আধুনিকা হলেও রিমি মেয়েটা খুব মিশুক। তাই ওর সাথে ফ্রি হতে বেশি বেগ পোহাতে হয়নি। ধীরে ধীরে সে সবকিছু শেয়ার করতে থাকে। কখন কোথায় গেল না গেল সবকিছুই। সেই ‘মেঘলা মেয়ে’ নামের আইডি দিয়েই আদ্রি একটু একটু করে বোঝানোর চেষ্টা চালাতে থাকে যে, কারও সংসার এভাবে ভাঙা অনুচিত। এতে অনেক গোনাহ হয়, শয়তানই কুমন্ত্রণা দিয়ে এসব করায় মানুষকে। এভাবে তাদেরকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। আদ্রি মনপ্রাণ দিয়ে বোঝাতে থাকে যেন এসব থেকে সরে আসে মেয়েটা।

কিন্তু রিমি আদ্রিকে উল্টো বোঝায়, ‘এসব সেকেলে চিন্তা বাদ দাও তো বন্ধু। এসব এখন কিছুই না। পারলে নিজেও প্রেম করো, দেখবে জীবন কতটা রঙিন।’

কিন্তু তাও হাল ছাড়বার মেয়ে নয় আদ্রি। সে একপাক্ষিক চেষ্টা চালিয়ে যায় যতটা সম্ভব। যদি মেয়েটা একদিন নিজের ভুল বুঝে ফিরে আসে সেই আশায়।

কিন্তু হেদায়েত হয়তো তার ভাগ্যে লেখা ছিল না। মেয়েটার বেপরোয়া চলাফেরায় অধৈর্য হয়ে যায় আদ্রি। এরপর একদিন আসল আইডি দিয়েই সুমনের কথা জানতে চায় সে। রিমিকে মেসেঞ্জারে কল দিয়ে বলে, 'সুমনের সাথে আপনার কী সম্পর্ক? আপনি একজন মেয়ে হয়ে কী করে একটা মেয়ের সংসারে আগুন ধরাচ্ছেন? কী করে একটা বিবাহিত ছেলের মাথা খাচ্ছেন?'

'আপনি কী বলছেন এসব? ভদ্র ভাষায় কথা বলুন।' রেগে গিয়ে বলে রিমি।

'ভদ্রতা আপনার মতো একজন নষ্ট মেয়ের কাছে শিখতে হবে? যে কিনা অন্যের স্বামীকে ফুসলিয়ে-ফাসলিয়ে নিজের দিকে টানে!'

'আমি নষ্ট মেয়ে? আপনার জামাই তো খুব ভালো, তাই না? তাহলে আপনি পারেননি কেন আপনার ভালোবাসা দিয়ে তাকে আগলে রাখতে? আপনার ব্যর্থতার দায় কেন আমার ওপর চাপাবেন? নিজের চরিত্রহীন জামাইকে আগলে রাখতে জানেন না আবার আমাকে এসেছেন এসব বলতে? বাহ, চমৎকার!'

রাগে ক্ষোভে আদ্রির মাথায় যেন খুন চেপে বসেছে। চিৎকার করে বলল, 'মুখ সামলে কথা বলুন আপনি। শত হলেও সে আমার জামাই। চরিত্রহীন হয়েছে সে আপনাদের মতো নির্লজ্জ মেয়েদের জন্যই। কোন মেয়ে চায় নিজের স্বামী পরনারীর কাছে যাক?'

ওর মুখে জামাই শুনে রিমি হেসে উঠে বলে, বাহ! দারুণ বলেছেন! জামাই! হ্যাঁ আপনারই তো জামাই। ওই কাগজে-কলমে আরকি! আচ্ছা, আপনি কীসের এত বড়াই করেন? আপনার রূপ দিয়ে আপনার জামাইকে আটকে রাখতে পারেননি কেন? সে কেন আসে আমার কাছে?'

'অবশ্যই রাখব, আপনাকে সেটা বলতে হবে না। আপনি আমাদের মাঝখান থেকে সরে যান প্লিজ।' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় আদ্রি। মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে থাকে, রাগ না দেখিয়ে নরম ভাষায় কথা বলে দেখি মেয়েটাকে ফেরানো যায় কি না। না হলে যে সব হারাতে হবে। সুমনকে হারিয়ে সে কার কাছে যাবে?

'প্লিজ আপু, আমি আপনার বোনের মতো। প্লিজ আমার সংসারটা আমার কাছ

থেকে কেড়ে নেবেন না। আপনার একটা বোন ভেবে না হয় আমার ওপর দয়া করুন। আপনার ছোট বোনের যদি আজ এমন হতো, পারতেন আপু এমন করতে? আমি আপনার কাছে আমার সংসারটা হাত জোড় করে ফেরত চাই প্লিজ। ছেড়ে দিন ওকে, দয়া করুন আমার ওপর। আমার সুমনকে আর পাপী করবেন না প্লিজ। আমি চাই না সে জাহান্নামি হোক। আমি ওকে নিয়ে বাকি জীবন কাটাতে চাই। আপুরে! আমার কিছু নেই ও ছাড়া। প্লিজ বোন, ওকে ফেরত দিন।' কাঁদতে কাঁদতে মিনতি ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে আদ্রি।

আদ্রির কান্নায় সমস্ত পৃথিবী যেন থমকে যায়। বৃষ্টির সাথে একাকার হয়ে আদ্রি কাঁদতে থাকে পাগলের মতো।

রিমি আদ্রির কান্নায় হতভম্ভ হয়ে যায় হঠাৎ করে। দু-পাশে অদ্ভুত নীরবতা ছেয়ে যায়। রিমি এক মুহূর্তের জন্য ভাবতে থাকে অনলাইনে তার সেই বান্ধবী 'মেঘলা মেয়ে'র কথাগুলো। জীবনে সে অনেক পাপ করেছে। আরেকজনের সংসার ভাঙা যে মস্ত বড় পাপ তা সে জেনেছে এরই মধ্যে। মুহূর্তের মাঝে ওর মনে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলতে থাকে। কী বলবে বুঝতে না পেরে আদ্রিকে কান্না অবস্থায় রেখেই ধুম করে সে লাইন কেটে দেয়।

এদিকে আদ্রি কান্না করতে করতে ফ্লোরে লুটিয়ে পড়ে। চূর্ণবিচূর্ণ আদ্রির কান্না দেখছিলেন শুধু আল্লাহ। পৃথিবীর আর কেউ দেখেনি তার বুকফাটা সেই যাতনা। কতটা কষ্ট বুকে চেপে রেখেছিল সে!

একটু পরেই রিমি কী ভেবে যেন একটার পর একটা স্ক্রিনশট পাঠাতে থাকে আদ্রির কাছে। দেখায় অশ্লীল সব মেসেজ সুমনের। প্রতিদিন দেখা না হলেও নিয়মিত তাদের ভিডিও চ্যাট হয় সেটাও জানাল আদ্রিকে।

আদ্রি ভাবতে থাকে স্টাডি রুমে অফিসের কাজের কথা বলে তবে এসবই চলে? আজকাল সুমন সেখানেই ঘুমায় কাজের বাহানায়। ইয়া আল্লাহ! আমি কি এতটাই জঘন্য যে আমার সাথে একই বিছানায় ঘুমানোও যায় না? ভাবতে ভাবতে আদ্রি চোখ মুছে সব দেখতে থাকে। দু-চোখ দিয়ে অবিরাম বর্ষা যেন ঝরতেই থাকে। এই কান্না কি সব হারানোর? সে কি জীবনে কিছুই পাবে না? কী পাপ করেছিল সে? সে কী জন্ম থেকেই অপয়া একটা মেয়ে? তার শাশুড়ি তো ঠিকই বলেন। না হলে কেন এমন হবে তার সাথে সব সময়? না এটা ভুল বিশ্বাস।

‘ইয়া রব, সুমনকে তুমি ফিরিয়ে দাও। আমাকে সুমনের জন্য চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দাও। আমার সংসারে তুমি সুখ এনে দাও।’ এক মনে রবের কাছে চাইতে থাকে আদ্রি। কে আছে তার দয়াময় রব ছাড়া?

‘বউমা, কোথায় তুমি? বলি কয়টা দাসী-বাঁদি এনেছ বাপের বাড়ি থেকে? সাহরির সময় যে চলে যাচ্ছে সেদিকে কোনো খেয়াল আছে? কোনো খবর নেই কেন? আমার ওষুধটাও তো দিয়ে গেলে না।’ ভেতর থেকে আসা শাশুড়ির ডাকে আদ্রির ঘোর কেটে যায়। সে দ্রুত চোখ মুছে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখে শ্বশুর এগিয়ে আসছে।

‘এত রাতে ব্যালকনিতে কী করো মামণি? বলি, ভূত-প্রেতের ভয় নেই নাকি?’ আদ্রির শ্বশুর শারাফাত চৌধুরী মুচকি হেসে বলেন।

এই বাড়িতে আদ্রির একমাত্র মায়ার আশ্রয় এই শারাফাত চৌধুরী। তিনিই একার হাতে যতটা পারেন ওকে আগলে রাখেন। কিন্তু সেটাই-বা কতক্ষণ? তারও তো বাইরে কত কাজ থাকে।

আদ্রি কিছু বলার আগেই পেছন থেকে ওর ননদ সামিরা ফিক করে হেসে বলে ওঠে, ‘ভাবি নিজেই তো একটা পেত্তুনি বাবা, তার আবার ভূত-প্রেতের কী ভয় থাকবে?’

‘পেত্তুনি’ শব্দটা শুনে আদ্রির পা যেন ফ্লোরের সাথে আটকে যায়। সে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে বেড়াতে আসা ননদ সামিরার দিকে। ওর শ্বশুর দ্রুত বলে ওঠেন, ‘এই, থামবি তুই? মা, যাও তো যাও। টেবিলে ভাত দাও দ্রুত। সময় নেই বেশি।’

আদ্রি তাড়াতাড়ি তরকারি গরম করে টেবিলে সবার জন্য খাবার সাজিয়ে দেয়। নিজেও সামান্য নিয়ে রুমে চলে আসে। কিন্তু গলা দিয়ে কিছু যেন নামতে চায় না। অস্থির লাগে ভীষণ তার। অদ্ভুত ব্যাপার হলো মন খারাপ থাকলে সে কিছু জোর করেও খেতে পারে না।

ভাতটা একটা পলি ব্যাগে ঢুকিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখে শাশুড়ি দেখার আগেই। নাহয় ভাতের খোঁটা শুনতে হবে সারা দিন। বাপের বাড়ি থেকে সে তো আর ভাত নিয়ে আসে না।

দ্রুত দুটো খেজুর খেয়ে নেয় সে। রাবু আপু কবে যেন বলেছিল সেহেরিতে খেজুর খাওয়া সুন্নাত। যাক সে আজকের রোজাটা একটা সুন্দর সুন্নাত দিয়ে শুরু করতে

পেরেছে আলহামদুলিল্লাহ। মন অনেকটা ভালো হয়ে যায় ওর। কিন্তু ননদ সামিরার বলা 'পেত্তুনি' কথাটা মাথার ভেতর ভনভন করে ঘুরতে থাকে। ইয়া রব, তোমার সৃষ্টির প্রতি এতটা তাচ্ছিল্য কেন তাদের? শুধুই কি গায়ের রঙের কারণে?

বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে আদ্রি। ভাবনার রাজ্যে উথাল-পাতাল ঢেউ ওঠে। একটা মাত্র শব্দের এত ক্ষমতা! আজানের শব্দ শুনে উঠে বসে আদ্রি, জায়নামাজে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে।

নামাজ শেষেও কাঁদতে থাকে সে, একটা মানুষ আর কত সইতে পারে এতটা অপমান? ইয়া রব, আমাকে এই আজাব থেকে রক্ষা করুন। অন্তরের ভেতর থেকে আসা এই দোয়ায় চমকে ওঠে আদ্রি। এটা কী দোয়া করল সে! অসহায় মন এটা কী চেয়ে বসল দয়াময়ের কাছে! নিজেকে বড্ড অসহায় লাগে আদ্রির। ছোটবেলার এলোমেলো স্মৃতিগুলো চোখে ভাসতে থাকে।

০২. কোথাও সুখ নেই

নতুন বাসার বারান্দা থেকে আকাশটাকে কেন যেন খুব কাছের মনে হয় নাদিয়ার। গোধূলির রক্তিম আভায় একাকার চারিদিক। শেষ বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গুনে গুনে পাঁচ রঙের মেঘের আবিষ্কার করল নাদিয়া। মনটা কেমন যেন ফুরফুরে লাগছিল আজ। ভেতর থেকে আদ্রি দৌঁড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আম্মি, কী দেখো? আমিও দেখব।'

'আমি না অনেক রঙের মেঘ দেখি মা, তুমি দেখবে?' নাদিয়া আদ্রির চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলে। চুলগুলি এত্ত রেশমি আর মসৃণ হয়েছে যে, সারাক্ষণ হাত বুলাতে ইচ্ছে করবে যে কারোর।

'সত্যি! আমিও দেখব আম্মি, আমিও দেখব। কোথায় "লঙ" মা? আমাকে "লঙগুলো" এনে দেবে? আমি ছবি আঁকব এমন কলে।'

আদ্রির কথা শুনে হেসে ওঠে নাদিয়া, মেয়েটা এখনো 'র' বলতে পারে না। 'র' সব 'ল' হয়ে যায় তার আদুরে মুখে।

'আকাশ থেকে এসব রং আনা যায় না মা। তোমাকে বাজার থেকে কিনে দেবো। ওই

দেখো কী সুন্দর মেঘের ভেলা! লাল, খয়েরি, সাদা, কালো কত কী রং!'

'আচ্ছা আম্মু, কালো মেঘগুলো তো আমাল মতো! এই মেঘগুলোও কি আমাল মতো কান্না করে?' আকাশে জমতে থাকা বর্ষার কালো মেঘেদের দিকে তাকিয়ে, মুখে একরাশ হতাশা নিয়ে বলে উঠল ছোট্ট আদ্রি।

কথাটা শুনেই নাদিয়া চমকে ওঠে। এটা কী বলল পিচ্চিটা? এত ছোট্ট একটা মেয়ে, যার মুখের বুলি-ই এখনো স্পষ্ট হয়নি, অথচ তার বোধগম্যতা যেন গগনচুম্বী। দ্রুত সে জিজ্ঞেস করে, 'কেন এমন বলছ মামণি?'

'ওই যে দেখো না কালো মেঘ আকাশে আসলেই বিত্তি আসে।' আদ্রি গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ছুঁয়ে দিতে দিতে বলে।

'হ্যাঁ তাও তো বটে। বৃষ্টিকে মেঘেদের কান্না বলে অনেকে।'

'কেন আম্মু? তাকেও কি সবাই কালো পচা মেয়ে বলে? পেত্তুনি মেয়ে বলে?'

নাদিয়া দ্রুত দাঁড়িয়ে যায়। আলতো করে আদ্রির মাথাটা বুকের কাছে এনে বলে, 'তোমাকে কি কেউ এমন বলে মা?' নাদিয়ার মাথায় তখন তুফানের গতিতে ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। মেয়েকে চারপাশের মানুষের যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে নতুন বাসায় এসেছে সে। এখানেও কি তাকে কেউ এমন কথা বলেছে? নাহয় এতদিন আগের কথা কী করে মনে পড়ল ওর?

আদ্রির বাবার চাকরির সূত্রে ওর জন্ম থেকেই ঢাকায় থাকা হয়। মেয়েটার গায়ের রং চাপা বলে জন্মের পরপরই নানা জনের নানা কথা শুনতে হয়েছে নাদিয়াকে। জন্ম নিতে না নিতেই মেয়েটাকে নিয়ে যা-তা বলছে তারই স্বজন নামের মানুষগুলো। মানুষ হলে তো মানবিকতা বলে কিছু থাকে, কিন্তু এদের মানবিকতা কোথায়? ভাগ্যিস জন্মের পর শিশুরা অবুঝ থাকে। বুঝলে হয়তো সেও কান্নায় ভেঙে পড়ত। সবচেয়ে আফসোসের ব্যাপার হলো মেয়ের দাদু ওকে দেখে এমনভাবে তাচ্ছিল্য করেছিলেন যে, সেটা খুবই দৃষ্টিকটু লাগছিল সবার চোখে। নাদিয়ার স্বামী আদিয়ান মাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত বলে কিছুই বলত না। তবে হেসে হেসে বলত, 'মা ও তো আমার কালো মানিক, ব্ল্যাক ডায়মন্ড। সবচেয়ে দামি। যা-ই বলো আমার মেয়ে কিন্তু মায়াবতী।'

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে নাদিয়া। আদ্রিকে দেখাশোনা, সেইসাথে সংসারের নানা কাজ। তাও সংসারের কাজের সময় আদ্রিকে দাদির কাছে রাখতে গেলেই তিনি নানান কথা বলে বসেন। এমনিতেই নিয়ম করে তিনবেলা মেয়েটাকে নিয়ে তার কত অভিযোগ। সেখানে নিজে থেকে তার কাছে নিয়ে গেলে তো বলার অবকাশ রাখেন না কিছু আর। আদ্রিকে রাখতে চান না নিজের কাছে, নানান ছুতোয় এড়িয়ে যান। এদিকে মেয়েকে নিয়ে একা হাতে সব কাজ করতে হিমশিম খায় নাদিয়া। আদিয়ান সবই দেখে বুঝে, তাও চুপ করে থাকে। তবে সেও চেষ্টা করে অফিস থেকে ফিরে নাদিয়াকে কিছুটা সাহায্য করতে। এভাবেই ধীরে ধীরে সময় যেতে লাগল। আদ্রিও একটু একটু করে বড় হতে লাগল। চার বছরের আদ্রি টুকটাক অনেক কিছু বুঝতে পারে এখন। তাই সেও এখন যথাসম্ভব দাদিকে এড়িয়ে চলে।

আদিয়ান একদিন অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে শুনে মা বলছে, 'এটা কেমন মেয়ের জন্ম দিলি বউ? সাত পুরুষের সম্পদ বেইচ্চাও তো আমার পোলা এই মাইয়া বিয়ে দিতে পারব না। হায় হায় আমি আগেই কইছিলাম এমন মাইয়ারে বিয়ে করিস না, আমি তোকে সুন্দর একটা কচি মাইয়া বিয়ে করামু, পোলা কি আমার কথা শুনে? কী রূপ তর দেখছে আল্লাহ জানে। দেখ, এখন মাইয়াও একটা হইছে তর মতন।'

'আহ মা, কীসব বলছ পাগলের মতো?!' আদিয়ান বিরক্ত মুখে অফিসের ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলে ওঠে।

'হ, বুঝি তো! এখন মাকে তোর পাগলই মনে হইব, কী যাদু-টোনা করছিল তোরে এই বেটে কালো মাইয়াটা?'

রাগে আদিয়ানের মা জোহরা বেগমের চোখদুটো ধপ করে জ্বলে ওঠে।

'মা চুপ করবে তুমি? প্লিজ! যা মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছ। মাগো, আল্লাহ নারাজ হন এসব বললে। এমন বলতে হয় না আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে। আদ্রি তো আমারই মেয়ে মা। তোমাদেরই তো বংশধর, তাই না?'

'অসম্ভব! এইডা কীসের বংশধর? আমি তরে সুন্দর দেইখা আবার বিয়ে করামু। এই মাইয়ারে দেইখা বেবাকে আমারে লইয়া হাসাহাসি করে। আর কয়, দেখ জোহরা বেগমের নাতনি কেমন কালা পেত্নুনির মতো।'

নাদিয়া মেয়েটাকে বুকে চেপে ধরে কাঁদতে থাকে আর ওদের মা ও ছেলের কথা শুনে যায় চুপচাপ। সেইসাথে মনে-প্রাণে দোয়া করে, 'ইয়া রব, তোমার সৃষ্টি নিয়ে যারা এমন তাচ্ছিল্য করে, আমাদের দুজনকে তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নাও।'

শাশুড়ি মায়ের শেষ কথাটা শুনে নাদিয়া যখন ডুকরে কেঁদে উঠল তখন আদিয়ান চিৎকার করে বলে ওঠে, 'মা! থামবে তুমি!'

জোহরা বেগম চুপসে যান আদিয়ানের চিৎকার শুনে। আদিয়ান আদ্রিকে নাদিয়ার কোল থেকে নিতে নিতে আবার বলে, 'শোনো মা, ওকে নাতনি বলে স্বীকার করো বা না করো, ও আমারই মেয়ে, ওর শরীরে আমারই রক্ত। দরকার নাই তোমাদের ধন-সম্পত্তি আমাদের। তোমার ছোট ছেলেকে বিয়ে করিয়েছ না সুন্দরী দেখে? তাকে বলো সুন্দর সুন্দর তোমাদের মনমতো বংশধর জন্ম দিতে। আমার মেয়েকে নিয়ে আর একটা কথাও বলবা না তুমি। এতদিন অনেক সহ্য করেছি। ভেবেছিলাম বয়স হচ্ছে তোমার তাই হয়তো এমন করো। কিন্তু দিনকে দিন তুমি সহ্যশক্তির ঊর্ধ্বে চলে যাচ্ছ।'

'কীইই, এত বড় সাহস তোর! আমার ঘরে দাঁড়াইয়া আমারই মুখে মুখে তর্ক করস, রাগ দেখাস, ওই কালো মাইয়াটার জন্য?'

'ওহ, হ্যাঁ, তাই তো। স্যরি মা, আমি এখনই আমার কালো মানিককে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।'

'আহ, কী করছ পাগলের মতো! থামবে তুমি? মা বুড়ো মানুষ, কী না কী বলেছেন। তুমি চুপ করো না প্লিজ।' নাদিয়া চোখ মুছে আদিয়ানকে থামাতে চেষ্টা করে।

'হুম বুড়ো মানুষ, তার ওপর নিজের জন্মদায়িনী বলেই তো এতদিন তোমার ওপর করা অত্যাচার সব সহ্য করে গেছি নাদিয়া। সব দেখেও না দেখার ভান করে গেছি। কী ভাবছ? আমি জানি না তোমাকে আর আমার মেয়েকে মা কতটা তাচ্ছিল্য করেন? এতদিন তাও সহ্য করেছি, কিন্তু এখন বাবা হয়ে কীভাবে আমি এসব সহ্য করি বলবা?'

'না না, কোথায়! মা আমাদেরকে ভালোই বাসেন অনেক।' নাদিয়া আদিয়ানকে শান্ত

করতে চেষ্টা করে জানপ্রাণ দিয়ে। এত অশান্তি আর কিছুতেই সে নিতে পারছে না।

‘ওহ, আমার ছেলেডারে দিনরাত কানপড়া দিয়া, এখন আমার সামনে ন্যাকামি করস?! আমি বুঝি না ভাবতাছস?”’ নাদিয়ার শাশুড়ি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন।

‘ও মোটেই কানপড়া দেয়নি মা। সবাই যখন খেতে বসি, তুমি ওকে এটা-সেটার বাহানায় টেবিলে খেতে বসতে দাও না সবার সাথে। আমি বুঝি না ভেবেছ? মা, বলো তো সবার খাওয়া শেষে কেন সে প্রতিদিন পাতিল কাছানো ভাত-তরকারি খাবে?’

‘হায় হায়, পোলা আমার কী কয় দেখো দেখি! এইডাই তো আমাগো ঘরে ঘরে বউগোর নিয়ম। ওরে শেখাতে হইব না এহন থেইকা? আমরাও তো সারাডা জীবন এমনডা কইরা গেলাম।’

‘কেন এমন নিয়ম বানাও তোমরা? যে কিনা সারা দিন সব কাজ করবে, সবার মনমতো রান্নাবান্না করবে, টেবিল সাজাবে, সে কেন সবার খাওয়া শেষে খাবে মা? সে-ই তো সবার আগে খাওয়ার কথা তাই না? তুমি নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো তো! শেষ বয়সে এসে মুঠোয় মুঠোয় ভিটামিন আর ক্যালসিয়াম খাচ্ছ। কী লাভ হচ্ছে মা? যে বয়সে মনভরে প্রাণভরে মাছ-মাংস-ফল-মূল খাওয়ার কথা, সেই বয়সে তোমরা বউদের এভাবেই না খেয়ে রাখো। শেষ বয়সে সেসবের ঘাটতি কি সহজে মিটে বলো? আর তুমি নিজে যে সুযোগ-সুবিধা পাওনি তা নিজের বউদের কেন দিতে চাও না? তুমিও তো মেয়ে। ওদের কষ্ট তো তোমার বোঝার কথা।’

‘কীয়ের কষ্ট এগুলা আবার? আমি যেইভাবে এতডা দিন চইলা আইছি ও সেইভাবেই চলব ব্যস। নাইলে শোন, আমি তোরে আবার বিয়ে করামু সুন্দর মাইয়া দেইখা। আমি এই কালো মাইয়াডার ছায়াও দেখতে চাই না। আমাগো চৌধুরী বংশের নাম ডুবুক ওরে দিয়া, এইডা আমি কোনোভাবেই চাই না। তুই ওরে এহনি দিয়া আয় বাপের বাড়ি, টাকা-পয়সা যা লাগে লাগুক।’

‘আমাকে বিয়ে করাবে? হাহাহা। আমি ছোট বাচ্চা নাকি যে আমাকে ধরে বেঁধে বিয়ে করিয়ে দেবে? আমি চলে যাচ্ছি ওকে নিয়ে। আমার রাজকন্যাকে নিয়ে। ইনশাআল্লাহ তার ছায়াও দেখতে হবে না তোমাকে আর কখনো।’ বলতে বলতে আদিয়ান এগিয়ে গিয়ে নাদিয়ার হাত ধরে শক্ত করে বলে, ‘এসো নাদিয়া। কিছুই নেওয়া লাগবে না

তোমার এই বাড়ি থেকে, এই এক কাপড়েই চলো আমার সাথে।'

এভাবেই সেই রাতে আদিয়ানের হাত ধরে বেরিয়ে গিয়েছিল নাদিয়া, তাদের ছোট্ট রাজকন্যাকে নিয়ে। সেই রাতে আদিয়ান বাধ্য হয়ে তার এক বন্ধুর বাসায় ওঠে। সেখানে কিছুদিন থেকে কীভাবে যেন সে দুই রুমের একটা বাসা নিয়েছিল অফিসের পাশেই। সেই থেকে তাদের স্বপ্নের সংসার শুরু হলো।

'আমার নতুন স্কুলের মেয়েরা আমার পাশে বসতে চায় না মা, সবাই বলে কালো পচা মেয়ের পাশে আমরা বসব না।' আদ্রির কথায় নাদিয়া ফিরে আসে ভাবনার রাজ্য থেকে। নিজেকে কেমন যেন পাগল পাগল লাগে। এ কেমন পরিবেশের মানুষ এসব মেয়েরা? নাদিয়ার মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। মুহূর্তেই মনে হয় এই মেয়ের জন্য সব জায়গায়, সবার কাছে তাকে ছোট হতে হয় বারবার। আদ্রির মনে পড়ে মা সেদিন মাথাটা চেপে ধরে বসে পড়েছিলেন। কেমন যেন খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন থেকে। আদ্রিকেও অনেকটা এড়িয়ে যেতে শুরু করেছিলেন। নিজের মনে একা একা বিড়বিড় করতেন তিনি।

এরপর নতুন বাসাতে বেশিদিন থাকা হয়নি আর তাদের। চারপাশের চাপে দিনদিন আদ্রির মায়ের মানসিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল দেখে আদ্রির নানু জোর করে মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন।

মায়ের ব্যবহারের কারণেই হয়তো আদ্রি নিজেকে দায়ী মনে করতে থাকে। ভাবে, তার জন্যই হয়তো বাবার মৃত্যু হয়েছে। পাঁচ কি ছয় বছর হবে তখন। জ্বরের ঘোরে যখন ভীষণ প্রলাপ বকছিল, বাবা অফিস থেকে ছুটে এসে মা-সহ ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিলেন।

এটা-সেটা টেস্ট শেষে বাসায় ফেরার পথে ছোট্ট আদ্রি জলপাই খাওয়ার বায়না ধরে। জ্বরের মুখে হয়তো ভালো লাগবে খেতে। এই ভেবে বাবাও পাগলের মতো ফলওয়ালা খুঁজতে থাকেন। আদ্রির দেরি সহ্য হয় না। সে যদিও খাবে কি না সন্দেহ, কিন্তু জেদ করে কাঁদতেই থাকে। মা-ও কোনোভাবে ওকে শান্ত করতে পারেনি। এর মাঝে কিছু হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ওপাশে একটা ভ্যানে জলপাই দেখতে পেয়ে আদ্রিকে জোর করে মায়ের কোলে দিয়ে আদ্রির বাবা ছুটে যান ভ্যানওয়ালার কাছে। নাহ, আদ্রির আর সেই জলপাই খাওয়া হয়নি। ভ্যানওয়ালার কাছে যাওয়ার আগেই

ঘাতক ট্রাকের আঘাতে মাঝ রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে যায় আদিয়ান। মায়ের সেদিনের সেই চিৎকার এখনো কানে ভাসে আদ্রির। চোখে ভাসে সেই রক্তভেজা বাবার মুখ। সেই রক্তে যেন সে টকটকে লাল জলপাই দেখতে পায়। আদ্রিকে নিয়ে মা যখন ছুটে বাবার কাছে যাচ্ছিলেন ততক্ষণে রাস্তার সব গাড়িগুলো থেমে গেছে। সবাই জড়ো হয়েছে রক্তাক্ত আদিয়ানের পাশে। আদ্রির মা সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর কীভাবে কী হয়েছিল তেমন মনে পড়ে না আদ্রির। শুধু চোখে ভাসে সাদা কাপড়ে জড়ানো বাবার রক্তে ভেজা শুভ্র মায়াময় সেই প্রিয় মুখ। নানুর কোলে থেকে যে মুখটা একবার আলতো হাতে ছুঁয়ে দিয়েছিল সে কাঁদতে কাঁদতে।

আদ্রির বাবা মারা যাওয়ার পর দাদুর বাড়িতে ছিল তারা একটা বছর। এই একটা বছর মনে হচ্ছিল একটা যুগ পার হলো তাদের। উঠতে-বসতে খোঁটা দেওয়া ছিল সকলের রোজকার নিয়ম। ছোট মেয়েটাকেও বাদ দেয়নি কেউ। আপন দাদি হয়েও নাতনিকে এমনভাবে পেত্তুনি ডাকা যায় তা হয়তো আদ্রি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না।

আদ্রি এখনো জানে না বাড়ি ছাড়ার দিন মা কেন ওকে বুকে জড়িয়ে এমন হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন। কী ভেবেছিলেন আনমনা হয়ে। তার ভাগ্যের জন্য কি আদ্রিকেই দায়ী ভেবেছিলেন?

ওর আবছা কিছু স্মৃতি ভাসে চোখের সামনে, বাড়ি থেকে বৃষ্টিতে ভিজে ফেরার সেই দৃশ্যটা। মনে পড়ে দাদির ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়াটা। বুকের ভেতর কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে আজও সেসব মনে পড়লে। উফ! এতটা কষ্ট কেন ওর জীবনে?

০৩. ছেলেবেলার ছেলেখেলা

'আম্মু, ও আম্মু, আমাকে একটু কোলে নেবে? আমার খুব ভয় লাগছে।' ছোট্ট আদ্রি জানালা দিয়ে একটা কালো বিড়াল দেখে ভয় পেয়ে মায়ের কাছে গিয়ে বলে।

'এই, কেরে তুই?' বলেই নাদিয়া পাশে থাকা চিরুনিটা ছুঁড়ে মারে আদ্রির দিকে।

আদ্রি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে হাউমাউ করে। নাদিয়া দুই হাতে তার এলোমেলো চুলগুলো চুলকাতে চুলকাতে অবাক হয়ে ভাবে, 'এই মেয়েটা কাঁদছে কেন?'

সে আবারও মারতে তেড়ে আসে আদ্রির দিকে। আদ্রি মাকে আসতে দেখেও সেখানেই বসে বসে কাঁদতে থাকে অভিমানে। বাবা চলে গেলেন তাকে ছেড়ে, মাও এমন হয়ে গেলেন! সে কার কাছে যাবে? কে তাকে আদর করবে?

নানু কোথা থেকে যেন দৌড়ে এসে আদ্রিকে কোলে নিয়ে বুকে চেপে ধরেন। আর কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'হায় পোড়া কপালি, বাবাকেও হারালি। মা থেকেও নেই। কেঁদে কী করবি আর? চল নানু তোকে মজা কিনে দেবো।'

আদ্রি আর কিছুই চায় না কারও কাছে। তার একটা আবদারের কারণে বাবাকে হারিয়ে আজ এই দশা। আবার না জানি কী হয়ে যায়।

'না না, নানু আমি মজা খাব না, বাবাকে আমার কাছে এনে দাও! ও নানু! বাবাকে কোথায় রেখে এলে? আমার বাবা তো আমাকে ছাড়া ঘুমাতে পারে না। আমাকে জড়িয়ে না ধরলে যে বাবার ঘুম আসে না। ও নানু, বাবাকে কেন মাটির ঘরে রেখে এলে?'

আদ্রির কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে যায়। নাদিয়া জানালা দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু সেই দৃষ্টিতে বাস্তব কোনো বোধ নেই। আদ্রির কান্নাও তাকে স্পর্শ করে না।

আদ্রির মনে পড়ে বাবাকে সে যেমন চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছিল, তেমনই হারিয়েছিল মাকেও। যদিও মা জীবিতই ছিলেন। বাবা মারা যাবার পর মা যখন দাদুর বাড়ি ছিলেন, সে বছর দাদু আর চাচিদের দেওয়া মানসিক যন্ত্রণায় মা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। কেমন যেন মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে অনেক। এমনকি একটু একটু করে মানসিকভাবে পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হয়ে গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্যরকম একজন মানুষ। যে মানুষটা ছোট্ট আদ্রিকে চিনে না, আদর করে না। ওকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। আদ্রি কাছে গেলেই চিৎকার করে তাকে মারতে চায়। সেই থেকে সে নানুর কাছেই মানুষ হতে থাকে।

আদ্রির মামারা আদ্রির মাকে সুস্থ করতে অনেক চেষ্টা করেন। দীর্ঘ চিকিৎসার ফলে একটা সময় আদ্রির মা সুস্থ হয়ে উঠলেও মায়ের সাথে তার সেই দূরত্বটা আর কাটেনি। নাদিয়ার অবচেতন মন কেন যেন মনে করত আদিয়ানের মৃত্যুর জন্য তার মেয়ে আদ্রিই দায়ী। সেদিন যদি মেয়েটা অমন করে জলপাই খাওয়ার আবদার না

করত তবে তো তার আদিয়ান তাকে ছেড়ে যেত না কখনোই।

এই মেয়েই তাকে শ্বশুরবাড়ি-ছাড়া করেছে, স্বামীহারা করেছে। না না! এমন অপয়া পেত্নি মেয়েটা তার হতে পারে না। এর ছায়া মাড়ালেও সে সুখের দেখা পাবে না কখনো। নাদিয়ার মাথায় এমন এলোমেলো সব ভাবনা-চিন্তা ঘুরে।

কে তাকে বোঝাবে অপয়া বলতে কিছু নেই ইসলামে! মানুষের ভালো-মন্দ, হায়াত-মউত সবই ভাগ্যে নির্ধারিত। কে তার এই ভুল ধারণা ভেঙে দেবে? তেমন বুঝদার কেউ তাদের সংসারে ছিল না। ফলে সমাজের অধিকাংশ অজ্ঞ মানুষের মতো এক অসহায় মায়ের মনেও তার কালো মেয়েটা এমন অপয়া হয়েই রইল।

সেই ছোট্ট বেলার এই কঠিন দুঃসময়ে আদ্রির একমাত্র সুখের স্মৃতি বলতে ছিল তার মামাতো ভাই-বোনদের সাথে খেলার সময়টা। সেই মেঘলা মেয়ে আদ্রির ছোটবেলার রাজকুমার ছিল সামিন।

ওদের পরিবারটা ছিল অনেক বড়। সব কাজিনরা মিলে একসাথে বড় হচ্ছিল। নানা-নানুর বর্তমানে তখনও কেউ আলাদা হতে পারছিল না। তাই ছোটদের মজাটা বেশি ছিল অনেক।

মামিরা সংসারের নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আদ্রির মায়েরও মেয়ের দিকে কোনো খেয়াল ছিল না। নানুও ততদিনে বুড়ো হয়ে গেছেন অনেকটা। এটা-সেটা নানা কাজে ব্যস্ততা থাকেই তার। আদ্রির পড়াশোনা থেকে শুরু করে কোনো কিছুর দিকেই তাই কারও তেমন খেয়াল ছিল না। ফলে আদ্রি মানুষ হয়েছে নিজের মতো করে।

দুই বেলা মাস্টার এসে পড়িয়ে যায় আর যে যার মতো স্কুল মাদরাসায় যায়। সকালে মক্তবে গিয়ে তো কুরআন পড়া শিখছেই। এর চেয়ে বেশি কিছু শেখানোর বা জানানোর আছে বলে তারা মনে করতেন না কখনো।

কাজিনদের সাথে সারা দিন চলত খেলাধুলা আর দুষ্টুমি। মামিরা এত বড় সংসার সামলাতে গিয়ে ছেলে-মেয়ের দিকে আলাদা নজর দিতে পারেননি কেউ-ই। সকাল বেলার মক্তবে হুজুরের কাছে কুরআন মাজিদ পড়ানোটাই তাদের কাছে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব হিসেবে যথেষ্ট ছিল আর দশটা সাধারণ বাঙালি পরিবারের মতোই। পর্দা সম্পর্কে অসচেতন থাকলেও নামাজ-রোজার দিকে সবারই মোটামুটি নজর ছিল